কথার কথা

মৈত্রীশ ঘটক (July 24, 2021)

[অর্থনীতি ও অনর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র ও শব্দের অর্থানুসন্ধান, অর্থকরী ও অনর্থক, অর্থময় ও অর্থহীন সমস্ত বিষয় নিয়ে খামখেয়ালি চিন্তাভাবনা]

আলোচনা হচ্ছিল ট্রোল নিয়ে। এক অর্থে ট্রোল হল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপকথার খানিক মানুষ-খানিক রাক্ষস বা দৈত্য গোছের প্রাণী, যারা বেশ দুষ্ট প্রকৃতির এবং মানুষদের নানারকম ভাবে হেনস্থা ও উপদ্রব করা তাদের কাজ। ট্রোল দৈত্যাকার ও হিংস্র হয় (যেমন হ্যারি পটার-এ), আবার খর্বাকৃতি ও খানিক মিচকে প্রকৃতিরও হয়। গুটিয়া দেও বলে এক খুদে দৈত্য ছিল, শান্তা ও সীতা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথায়, নামটা বেশ মনে ধরেছিল। আমার কল্পনায় ওকে খানিকটা ট্রোলের

মতো দেখতে। আর মিল পাই খোক্কসের সাথে ('ঠাকুমার ঝুলি'-তে ছবি আছে), যা হল রাক্ষসের ছোট সংস্করণ। খোক্কস কি খোকা রাক্ষস? কে জানে! যাই হোক, ট্রোলদের খোক্কস বলাই যায়।

আন্তর্জালিক দুনিয়ায় এক নতুন প্রজাতির খোক্কসের উদ্ভব হয়েছে। এদের কাজ হল ঝগড়া বাধানো এবং করা। আপনি কোনও লেখা লিখলেন অনলাইন কোনও পত্রিকায় বা ফেসবুকে খানিক মনের-প্রাণের কথা লিখলেন, অমনি এই ট্রোলেরা এসে আপনাকে জ্বালাতন করা শুরু করবে— গায়ে পড়ে ঝগড়া, অহেতুক বিতর্ক উস্কে দেওয়া থেকে শুরু করে নেহাতই গালিগালাজ করাই এদের কাজ। মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধান বলছে ট্রোলের আধুনিক অর্থ হল 'to antagonize (others) online by deliberately posting inflammatory, irrelevant, or offensive comments or other disruptive content'— অর্থাৎ খানিক নারদ, খানিক খোক্কস, আর খানিক ঝগড়ুটে।

ঘটনা হল আন্তর্জালে এই ঝগড়ুটেদের বা বৈদ্যুতিন গুন্ডাদের খুবই বাড়বাড়ন্ত। রাজনৈতিক দলগুলির এখন আইটি সেল থাকে— যাদের কাজ শুধু প্রচার নয়, বিপক্ষের মতকে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতপ্রকাশকারীকে সরাসরি আক্রমণ করা। তাদের অনেকের এটাই পেশা (এই নিয়ে স্বাতী চতুর্বেদী-র *I Am a Troll: Inside the Secret World of the BJP's Digital Army*, Juggernaut Books, 2016 বইটি অবশ্যপাঠ্য) আবার অনেকে এই কাজটা একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীদের মতো স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে করেন।

এক-একটা কথা অদ্ভুত স্মৃতি উস্কে দেয়। 'পেশাদার ঝগড়ুটে' কথাটা মনে করিয়ে দিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক' উপন্যাসে বর্ণিত একটি ঘটনার কথা। তাতে এক চরিত্র ছিল, একজন বয়স্ক মহিলা, যিনি পেশাদার ঝগড়ুটে। তিনি এরকম একটা কাজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন কিন্তু একনাগাড়ে গালিগালাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাঁর সহকারিণীদের বলছেন যে আমি একটু পান খেয়ে জিরিয়ে নিই, তোরা এবার ধর এবং তারা গালিগালাজে

কিছু ভুল করে ফেলায় (যথা, মুখে কুট নয়, কুঠ অর্থাৎ কুষ্ঠ হয়েছে) এবং যথাস্থানে পা-দাপানো ঠিকঠাক না হওয়ায় তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের মতোই দুঃখপ্রকাশ করছেন... কবে শিখবি এসব! এঁর নাম ঝাড়ুনি, যা মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পে পেশাদার বিলাপকারীর মতো তাঁর পেশাগত নাম বলেই ধরে নেওয়া যায়। পেশাদার ঝগড়ুটে হিসেবে 'ঝাড়ুনি' নামটি বেশ উপযুক্ত। এর পুংলিঙ্গ 'ঝাড়ুয়া' বা 'ঝেড়ো' রাখা যেতে পারে, কারণ ঝাড়ুদার বললে অন্য পেশার কথা মনে হবে যার সাথে এর কোন মিল নেই, আর জঞ্জাল পরিষ্কার করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর কাজ যে, দুটোর কোনওটাই পেশাদার ঝগড়ুটেদের ক্ষেত্রে খাটে না।

কিন্তু ঝাড়ুনি বা ঝেড়োই বলি বা লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দ হিসেবে, খোক্কস— আর তারা পেশাদারই হোক বা স্বেচ্ছাসেবক— এমন কিন্তু নয় যে তারা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, যাদের একবার চিহ্নিত করে দুয়ার এঁটে বাইরে রাখলেই এড়ানো যায় এবং সব সমস্যা মিটে যায়। আমাদেরই চেনা-পরিচিত মহলে তাদের অনেক সময় দেখা যায়। ভূতপ্রেতের মতো খোক্কসরাও যে কোনও সময় যে কারোর ওপর ভর করতে পারে।

আন্তর্জালিক দুনিয়ায় এক নতুন প্রজাতির খোক্কসের উদ্ভব হয়েছে। এদের কাজ হল ঝগড়া বাধানো এবং করা। আপনি কোনও লেখা লিখলেন অনলাইন কোনও পত্রিকায় বা ফেসবুকে খানিক মনের-প্রাণের কথা লিখলেন, অমনি এই ট্রোলেরা এসে

আপনাকে জ্বালাতন করা শুরু করবে— গায়ে পড়ে ঝগড়া, অহেতুক বিতর্ক উস্কে দেওয়া থেকে শুরু করে নেহাতই গালিগালাজ করাই এদের কাজ।

আসলে সমাজমাধ্যম যেমন আপাতবাস্তব এই পরিসরে চটজলদি সৌহার্দ্য ও আলাপচারিতার সুযোগ করে দিয়েছে, আবার একই সাথে কিছু প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের রাশও আলগা করে দিয়েছে। যে-ভাষা সর্বসমক্ষে ব্যবহার করতে পাকা ঝাড়ুনিরাও ইতস্তত করবে, এক যান্ত্রিক প্রাচীরের সুরক্ষাবলয় যেন মেঘের আড়াল থেকে সেই ভাষার অস্ত্রনিক্ষেপ করার অবাধ স্বাধীনতা করে দিয়েছে এই আধুনিক মেঘনাদদের।

প্রশ্ন হল, এটা করে তাদের কী লক্ষ্যসাধন হয়? কাউকে আক্রমণাত্মক ভাবে কথা বললে তার মতপরিবর্তনের কোনওই সম্ভাবনা নেই, বড়জোর অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্যে লোকে চুপ করে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, অন্যরা এটা দেখে আগেভাগেই বিতর্কিত কোন বিষয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করাই মঙ্গল বলে চুপ করে থাকে।

আসলে মারামারি করার মতো ঝগড়া করারও একমাত্র লক্ষ্য শক্তি প্রদর্শন করে নিজের আধিপত্য জাহির করা, অন্য পক্ষকে চুপ করিয়ে দেওয়া। ঝগড়ায় কোনও রকমে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করাটাই যথেষ্ট। তাই দমে বা গলার জোরে টান না পড়লে কোনও পক্ষই থামতে পারেন না, কারণ থামা মানেই হার-স্বীকার। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়েরই আরেকটি উপন্যাসে ('আশ্চর্য ভ্রমণ') একটি ঝগড়ার অনবদ্য বিবরণ আছে, যেখানে বাসে দুই যুযুধান যাত্রী একনাগাড়ে ঝগড়া করে কথা (এবং সম্ভবত দম) ফুরিয়ে যাওয়ায় পরস্পরের প্রতি 'অ্যাঁঃ অ্যাঁঃ অ্যাঁঃ' আর 'ঙ ঙ ঙ!'

বলে যাচ্ছিল। অথচ যুক্তি বা তথ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারলে, গলা তোলার বা অর্থহীন চেঁচামেচি বা গালমন্দ করার দরকার হয় না। বাংলার রাজনীতি নিয়ে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক দেখে মনে হত, একমত না হলে একটা লেবেল লাগিয়ে দিলেই যুক্তি, বুদ্ধি, তথ্য কোনও কিছু ব্যবহার করার দায় থাকে না। আমি আপনার সাথে একমত নই, অতএব আপনি অতি দুষ্ট। কিন্তু বিজেমূল বা বামরাম বা দালাল এসব কথা না বলে 'লিঃ লিঃ' বা 'হোঃ হোঃ' বা 'ছোঃ ছোঃ' বললে আরও তাড়াতাড়ি নিজের মতটা প্রকাশ করা যায় না? আসলে পেশার দায়ে পরীক্ষার খাতা বা প্রবন্ধ পড়ে মূল্যায়ন করার দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি: সারশূন্য বক্তব্য যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই মঙ্গল।

কিন্তু, ঝগড়া আর তর্ক তো এক নয়। লোকে তর্ক করে কেন?

ঝগড়া যদি মারামারির সাথে তুলনীয় হয়— অর্থাৎ যেনতেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য, বিতর্ক সেখানে ক্রীড়ার মতো— জেতা মূল উদ্দেশ্য হলেও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, না হলে খেলা ভণ্ডুল। বিতর্কে তাই যুক্তি বা তথ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে হয়— গলা তোলা, অর্থহীন চেঁচামেচি বা গালমন্দ করা কার্যত পরাজয় স্বীকার করার নামান্তর। তাই এখানে ট্রোল বা খোক্কসরা যে রূপ নেয় তা আরেকটু সভ্যভব্য এবং তাই তাদের চট করে সব সময়ে চেনা যায় না। আর তর্কে জড়িয়ে পড়লে আমাদের মধ্যেও কোনও খোক্কস জেগে উঠতে পারে যার একমাত্র লক্ষ্য হল বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা। খেলায় যেমন স্থূল না হলেও সূক্ষ্ম ধরনের ফাউল আছে এবং নানা রকম অসাধু উপায় আছে, বিতর্কের ক্ষেত্রেও এরকম কিছু কায়দা আছে যা এই ছদ্মবেশী খোক্কসেরা ব্যবহার করে। যেমন ধরুন আপনি কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও কাজের সমালোচনা করলেন। এর বিরোধিতা করতে গেলে ঘটনাটির সংশ্লিষ্ট তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, অথবা কী কারণে এই কাজ করা হয়েছে তার ঠিকমতো বিচার-বিবেচনা করলে কাজটা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে যতটা অসমর্থনযোগ্য মনে হচ্ছে

ততটা মনে হবে না— এরকম মর্মেও একটা যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে। যিনি সমালোচনা করছেন তিনি পুরোপুরি না মানলেও, অন্তত বিপক্ষের মতামতটা কী শুনি, এই ভেবে আলোচনা হতে পারে।

যতই হোক, কোনও পক্ষেরই (সে দলই হোক বা মতবাদ) সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়, আর তাই বিতর্ক ও আলোচনার কোনও বিকল্প নেই। সবাই সব বিষয়ে একদম একমত হলে, কথাবার্তা একদম পানসে হয়ে যায়।

অথচ, সমাজমাধ্যমে নানা বিতর্কে তার থেকে বেশি যা শুনবেন তার পরিচিত কতগুলো নমুনা আছে । একটা উদাহরণ দিই, যেটার নাম দেওয়া যায় 'তার-বেলা-পনা' (whataboutery)। মানে, মানছি কাজটা ঠিক নয় কিন্তু অন্যরা যখন এটা করে, তার বেলা? যেমন : 'এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত? আগের জমানা কি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল?' এই ধরনের যুক্তির দুটো প্রধান সমস্যা। এক, মূল বক্তব্যের ওপর আর তর্কটা সীমাবদ্ধ থাকছে না, সেটা হচ্ছে সমালোচকের পক্ষপাত নিয়ে এবং তাই সমালোচনাটা কার্যত অবৈধ বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুই, এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য হল, কোনও দলই ধোয়া তুলসীপাতা নয়, তাই এসব আলোচনার অর্থ একমাত্র দল বা মতাদর্শগত পক্ষপাতের জায়গা থেকেই লোকে করে। এটা বেশ পিচ্ছিল একটা যুক্তি, কারণ তাহলে কোনওকিছুর তুলনামূলক ভাল-মন্দ বিচার করারই অর্থ হয় না। সাহিত্যে 'তার-বেলা-পনা'র বিখ্যাত উদাহরণ হিসেবে মনে করে দেখুন অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়া:

‘তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?’
(‘খুকু ও খোকা’, ১৯৪৭)

এখানে যুক্তিটা খানিকটা খাটে কারণ দুটি অপরাধ তুলনীয় নয়, সবাই মানবেন যে তেলের শিশি ভাঙাটা তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু কোনও সরকারের আমলে দুর্নীতি বা রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা নিয়ে কথা উঠলেই যদি উত্তর হয়, অন্য জমানাতেও হয়েছে, তাহলে তার মানে দাঁড়ায় যে ‘এসব হয়েই থাকে’, ফলত রাজনৈতিক জমানা নির্বিশেষে এই অবাঞ্ছিত বিষয়গুলি কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, সেই আলোচনা শুরু হবার অবকাশ থাকে না এবং স্থিতাবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই— এই ধরনের নৈরাশ্যের বোধ ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই হয় না।

যারা রাখঢাক না করে প্রকাশ্যেই ট্রোলিং করে, তাদের কাজই হল বিপক্ষকে গলার জোরে চুপ করিয়ে দেওয়া আর অন্যদের কাছে উদাহরণ খাড়া করা যে এদিক-ওদিক কথা বললে তার কী ফল হতে পারে। কিন্তু যারা প্রচ্ছন্নভাবে (এবং কখনও হয়তো সচেতন না হয়েই) বিতর্কে বিপক্ষের বক্তব্য তার-বেলা-পনা-র মতো কিছু প্রচলিত কায়দায় থামিয়ে দেয়, তারাও কার্যত বিতর্ক ও আলোচনার পরিসরকে সংকীর্ণ করে দেয়। এর অনিবার্য পরিণতি হল আলাপ-আলোচনার বৃহত্তর পরিসর থেকে সরে এসে সহমতসম্পন্ন মানুষে ভরা প্রতিধ্বনি-কক্ষে আটকে থাকা।

এর বিপদ হল টিকা না নিলে যেমন কিছু অসুখ হতে বাধ্য, সেরকম দলমতনির্বিশেষে খোলাখুলি আলোচনার পরিসর সংকীর্ণ হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলে ক্ষমতাসীন (সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক বা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হোক) পক্ষের ভুলত্রুটি সংশোধনের অবকাশ থাকে না আর তার কুফল হয় দীর্ঘমেয়াদি। যতই হোক, কোনও পক্ষেরই (সে দলই হোক বা মতবাদ) সর্বদা

এবং সর্বক্ষেত্রে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়, আর তাই বিতর্ক ও আলোচনার কোনও বিকল্প নেই। সবাই সব বিষয়ে একদম একমত হলে, কথাবার্তা একদম পানসে হয়ে যায়। শুধু তাই না, তার থেকে কারোর কিছু শেখারও থাকে না, বদ্ধ ডোবার মতো পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন বা বিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

তাহলে উপায় কী? বিতর্ক যাতে ঝগড়া না হয়ে দাঁড়ায়, এবং প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন খোক্কসদের দাপটে যাতে আলোচনা বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্যে খেলার মাঠে যেমন সেরকম সমাজমাধ্যমেও নিজে থেকেই কিছু রীতিনীতির প্রবর্তন আবশ্যক, ঠিক পাড়ার খেলাতেও যেমন দরকার হয়, যার জন্যে বহিরাগত কোনও রেফারি বা আম্পায়ারের দরকার নেই।

মনে হতে পারে, এটা কি বাস্তবসম্মত? পৃথিবীর সর্বত্র রাস্তাঘাটে, দোকানে, বাজারে, পাড়ায়— সবজায়গাতেই তো এরকম কিছু নিয়মকানুন (যেমন, লাইনে দাঁড়ানো) স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গড়ে ওঠে, তা হলে নেটদুনিয়ায় হবে না কেন?

আজকের মতো শেষ করি সমাজমাধ্যম এবং তার তর্কবিতর্ক ও ঝগড়ার জমজমাট আসর নিয়ে এই ছোট্ট গুণগানটি দিয়ে (কবিগুরুর প্রতি যথাযথ মার্জনাভিক্ষা-সহ):

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
চাই বা নাহি চাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
কর্মব্যস্ত দিবসমাঝারে
কর্মনাশা হে বন্ধু মোর,
তর্কসায়রে তুফান তুলিয়া
আপনে করিলে পর।

ছবি এঁকেছেন সায়ন চক্রবর্তী